গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৪ সংখ্যা | ১৯ - ২৫ আগস্ট ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস স্মরণে

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস স্মরণে ১২ আগস্ট দলের শিবপুর সেন্টারে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের শিক্ষা থেকে

"...উৎপাদন যন্ত্রের দখল সমাজ নিজের হাতে তুলে নেওয়ার মধ্য দিয়ে পণ্য উৎপাদনের অবসান ঘটে, একই সাথে অবসান ঘটে উৎপাদকের উপর উৎপাদিত দ্রব্যের কর্তৃত্বও। সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় উৎপাদনের সুশৃঙ্খল, সুনির্দিষ্ট সংগঠন। ব্যক্তির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখনই প্রথম বারের জন্য আসে সেই সময় যখন একটা বিশেষ অর্থে মানুষ অবশিষ্ট প্রাণীজগত থেকে নিজেকে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করে;নেহাতই পশুর মতো জীবন কাটানোর অবস্থা থেকে তার উন্নয়ন ঘটে যথার্থই মানুষের মতো বেঁচে থাকার মতো পরিস্থিতিতে। জীবনধারণের যে সামগ্রিক পরিমণ্ডলের মধ্যে মানুষ এতদিন জীবন কাটিয়ে এসেছে এবং যে অবস্থাটা এতদিন পর্যন্ত মানুষের উপর কর্তৃত্ব করেছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রই এখন চলে আসে মানুষের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণে। এই প্রথম মানুষ প্রকৃতির সত্যিকারের সচেতন প্রভু হয়ে ওঠে। কারণ আজ সে পরিণত হয়েছে তার নিজস্ব সামাজিক সংগঠনের মালিকে। মানুষের নিজস্ব সামাজিক ক্রিয়া এতদিন যে নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, যা একটা বাইরের প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এত দিন তার উপর কর্তৃত্ব করেছে, এবার মানুষ তাকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে কাজে লাগাবে এবং স্বভাবতই, তার উপর সে-ই কর্তৃত্ব করবে। মানুষের নিজস্ব যে সামাজিক সংগঠন এতদিন প্রকৃতি ও ইতিহাসের দ্বারা আরোপিত এক আবশ্যিকতারূপে তার বিরুদ্ধে কাজ করে এসেছে, আজ তা হয়ে দাঁড়িয়েছে তারই স্বাধীন ক্রিয়ার ফল। মনুষ্য নিরপেক্ষ বাইরের যে শক্তি এতদিন ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করত, তা মানুষের নিজের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। শুধু এই সময় থেকেই মানুষ ক্রমে আরও বেশি সচেতনভাবে নিজেই নিজের ইতিহাস রচনা করবে, শুধু এই সময় থেকেই— মানুষ যে সামাজিক ভিত্তিগুলি গড়ে তুলেছে, তা প্রধানত এবং ক্রমাগত আরও বেশি পরিমাণে তার কাঙ্খিত ফল দিতে থাকবে। প্রয়োজনের রাজত্ব থেকে স্বাধীনতার রাজত্বে মানুষের উত্তরণ ঘটবে।"

— *সমাজতন্ত্র ঃ কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক*

জনগণের ভাগে তো শুধুই গরল

অমৃত পেল কারা

স্বাধীনতার অমৃতকাল

স্বাধীনতার এই মহা-আড়ম্বরের 'অমৃতকালে' বিশ্ব ক্ষুধা সূচক-এর ২০২১ সালের রিপোর্ট বলছে, সবচেয়ে ক্ষুধাতুর ১১৬টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০১ নম্বরে। আগের বছর দেশ ছিল ৯৪ নম্বরে। এক বছরে অগ্রগতি ভালই, সন্দেহ নেই! সম্ভবত আর কয়েক বছরের মধ্যেই একেবারে শেষ স্থানটিতে পৌঁছে যাওয়া যাবে।

কিন্তু খবরদার! স্বাধীনতার পরম পবিত্র 'অমৃতকালে' এ সব নিয়ে একদম হইচই নয়! স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী গত বছর ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার বুকে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী ২৫ বছর ধরে, অর্থাৎ স্বাধীনতার শততম বছর পর্যন্ত চলবে এই 'অমৃতকাল'। তাই এ বছরেও প্রধানমন্ত্রীর উদাত্ত আহ্বানে দিকে দিকে চলছে স্বাধীনতার 'অমৃত মহোৎসব'-এর উল্লাস। দেশভক্তি জাহির করতে তিনদিন ধরে প্রত্যেক ভারতবাসীকে তিনি ঘরে ঘরে জাতীয় পতাকা তোলার ডাক দিয়েছেন। কিন্তু দেশের যে ২০ কোটি মানুষ, যাদের মাথার ওপর কোনও ছাদই নেই, তারা পতাকা তুলবে কোথায়? ভুলেও এ প্রশ্ন তুলবেন না যেন! মনে রাখবেন, আমরা রয়েছি স্বাধীনতার পরম পবিত্র 'অমৃতকালে'। মন্ত্রী-নেতারা মানুষের ভাল চান না, এমন তো নয়! আন্তর্জাতিক সংস্থা 'এফএও'-র হিসাবে দেশের যে চরম দরিদ্র ১৯ কোটি মানুষের প্রায়দিনই পেটভরা খাওয়া জোটে না, স্বাধীনতা দিবসের 'অমৃত মহোৎসব'-এ কোথাও না কোথাও তারা হয়ত কাঙালিভোজনের সারিতে বসার সুযোগ পাবে! একদিন, একবেলা হলেও জুটবে ভালোমন্দ খাবার! পতাকা উড়িয়ে, মাইকে উচ্চৈঃস্বরে গান আর সুসজ্জিত মঞ্চে নেতা-মন্ত্রীদের গলা-কাঁপানো ভাষণ শুনিয়ে কোটি কোটি কর্মহীন তরুণ-

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিজেপির নীতিহীন ক্ষমতালিপ্সাকে পরাস্ত করবে এই নীতিবর্জিত সুবিধাবাদীরা?

বিহার

বিহারে বিজেপির সঙ্গে জোট ভেঙে বেরিয়ে এসে আরজেডি এবং কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করলেন জেডিইউ নেতা নীতীশকুমার। ফলে আপাতত বিজেপিকে রাজ্যের সরকার থেকে সরানো গেল। নীতীশ কুমারের এই চালকে কেউ কেউ মাস্টার স্ট্রোক বলছেন। হ্যাঁ, জোট রাজনীতি তথা ভোট রাজনীতির জন্য হয়ত তাঁর এই চাল মাস্টারস্ট্রোক। এই জোট বদলের দ্বারা নীতিশ কুমারের মুখ্যমন্ত্রীর গদি বাঁচল। তিনি অষ্টম বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পদে শপথ নিলেন। কিন্তু তাতে রাজনীতিতে নীতি বাঁচল কি? বিহারের সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত, নিপীড়িত মানুষের কোনও লাভ হল কি?

নীতীশ কুমার বলেছেন, বিজেপি মহারাষ্ট্রের কায়দায় তাঁর দল ভাঙার চেষ্টা করছিল। হয়ত তাই-ই। নীতীশ কুমার কখনও নীতির রাজনীতি করেননি। সুবিধামতো কখনও আরজেডির সাথে আবার কখনও বিজেপির সাথে জোটে গিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর দলের জনপ্রতিনিধিরাও যে বিজেপির টাকায় বা মন্ত্রীত্বের লোভে বিজেপির কাছে বিক্রি হয়ে যেতে পারেন, তাঁর এমন আশঙ্কা অস্বাভাবিক নয়। আর তা থেকেই তাঁর এই পদক্ষেপ। স্বাভাবিক ভাবেই নীতীশের এই চালে আদৌ কোনও নীতি আদর্শ কিংবা জনসাধারণের প্রতি দায়বদ্ধতার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। কোথাও নেই বিজেপির নীতিগত বিরোধিতা।

নীতীশের রাজনৈতিক ইতিহাস বারবার দলবদলের ইতিহাস। গত পাঁচ বছরে দু'বার জোট বদল করেছেন তিনি। ২০১৭-য় আরজেডির সঙ্গে জোট ভাঙার জন্য তেজস্বীর দুর্নীতিকে দায়ী করেছিলেন নীতিশ। আরজেডি নেতা তেজস্বী তো আজও দুর্নীতির অভিযোগ থেকে মুক্ত নন। তা হলে কোন নীতির ভিত্তিতে আবার তাঁর সাথে এই জোট গড়লেন তিনি?

লিবারেশন, সিপিএম প্রভৃতি দলগুলি নীতীশের এই জোটবদলকে বিজেপির অশ্বমেধের ঘোড়া আটকে দেওয়া বলে মত প্রকাশ করে নয়া জোটের সরকারকে সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু নীতীশ কুমারের এই নতুন জোটের মধ্যে নীতির কোন পরাকাষ্ঠা দেখলেন তাঁরা? নতুন জোটের কোন নীতির আকর্ষণে লিবারেশন-সিপিএম এই জোট-সরকারকে সমর্থন করলেন? আরজেডির রাজনীতি জাতপাত নিয়ে। নীতীশের রাজনীতি নীতিহীন। তা হলে এই জোট বিজেপির মতো একটি ধুরন্ধর দক্ষিণপন্থী দলকে আপাতত গদির লড়াইতে

দুয়ের পাতায় দেখুন

দুর্নীতিতে কে কম যায়!

টিভির উত্তেজিত অ্যাঙ্কর আর খবরের কাগজের পাতা জোড়া স্টোরিতে স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি আর গরুপাচার কাণ্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই মহারথীর গ্রেপ্তার, টাকার স্তূপের ছবি নিয়েই ক্ষতিপূরণের কী ব্যবস্থা হল— সবই চাপা পড়ে যাবে। মাঝে মাঝে ভোট প্রচারে নেতা-নেত্রীরা একে অপরের দিকে কালি ছুঁড়তে গিয়ে নিজেদের দুর্নীতির পাল্টা জবাবে টেনে আনবেন অন্যের

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ, মিছিল, জনসভা
আন্দোলনে এস ইউ সি আই (সি)

এখন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক তরজার আসর সরগরম। এমন কিছুদিন খুব হইচই চালিয়ে মিডিয়া দৌড়বে অন্য হাতেগরম উত্তেজনার পিছনে। দুর্নীতিগ্রস্তদের কী শাস্তি হল, দুর্নীতির মূল উৎপাটনের কী হল, ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষের দুর্নীতির কথা। 'ও আমার থেকে বেশি দুর্নীতি করেছে' এটা বোঝাতে পারলেই সব কাদা ধুয়ে যায়! কিন্তু জনগণ কি ভুলতে পারে তাদের কষ্টার্জিত পয়সা নিয়ে এই লুঠের কারবার! তাই

তিনের পাতায় দেখুন

নীতিহীন ক্ষমতালিপ্সা

একের পাতার পর

হারালেও আদর্শগত ভাবে তাকে রুখে দেবে, এই আশা তাঁরা কীসের ভিত্তিতে করছেন?

বিহারে দীর্ঘদিন ধরেই হয় আরজেডি না হয় নীতীশ-বিজেপি জোট সরকার চালিয়েছে। উভয়েরই নীতি এবং কার্যক্রম বিহারবাসীর কাছে স্পষ্ট। বিহারের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করেন। শিক্ষা-চিকিৎসা সহ সমস্ত মূল পরিষেবাগুলিতে জাতীয় সূচকের একেবারে নিচের দিকে বিহারের স্থান। বেকারি দারিদ্র কৃষকদের দুর্দশা মারাত্মক আকার নিয়েছে। দুর্নীতি সমাজের গভীর তল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কাগজে-কলমে মদ নিষিদ্ধ হলেও বিষমদে মৃত্যুর ঘটনা প্রায়শই সংবাদমাধ্যমের অন্যতম খবর হয়ে যায়। ছাত্রীরা সাইকেল পেলেও স্কুলগুলির পরিকাঠামো বলে কিছু অবশিষ্ট নেই। শিক্ষার মানচিত্রে বিহারের স্থান একেবারে নিচের দিকে। নীতীশ-আরজেডির নতুন জোটের সাথে বিজেপি-নীতীশ পুরনো জোটের নীতিগত কোনও ফারাক নেই। তা হলে এই জোটের সরকারের থেকে মানুষের নতুন কী আশা করার থাকতে পারে? প্রতি বারই আলাদা আলাদা একটা জোট হয়েছে, সরকার হয়েছে, প্রত্যেকটি সরকার চূড়ান্ত পুঁজিবাদী নীতি নিয়ে সবকার চালিয়েছে। জনস্বার্থের বিষয়টা পিছনে চলে গেছে। এ বারও লিবারেশন-সিপিএমরা যে এই জোট সরকারকে সমর্থন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন, তা কোনও নীতির ঘোষণা ছাড়াই। কিন্তু কেন তাঁরা এমন একটি জোট সরকারকেসমর্থন করলেন? আসলে এদের সবার লক্ষ্য '২৪-এর লোকসভা নির্বাচন। জোটে থেকে যদি দু-একটি এমপি সিট বাগানো যায়! এখানেও নীতির কোনও ব্যাপার নেই। একেবারেই বুর্জোয়া ভোট রাজনীতি।

বিজেপির সাম্প্রদায়িক তথা ফ্যাসিস্ট রাজনীতিকে পরাস্ত করা শুধুমাত্র তাকে রাজ্যের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে হতে পারে কি? তার জন্য তো প্রয়োজন আদর্শগত ভাবে তাকে পরাস্ত করা। মনে রাখা দরকার, ভোটে বিজেপির বিরোধিতা করা মানেই সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা বা ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। ভোটের স্বার্থে যে-কোনও দলই, এমনকি আর একটি সাম্প্রদায়িক দলও বিজেপির বিরোধিতা করতে পারে। কংগ্রেস কি ধর্মনিরপেক্ষ? কংগ্রেসের বিজেপি বিরোধিতা কি বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরোধিতা? একেবারেই নয়। তবে সেই কাজটি কি তার সদ্য-অতীত জোটসঙ্গী নীতীশের দ্বারা কিংবা জাতপাতের রাজনীতির কারবারি আরজেডির দ্বারা সম্ভব? শুধু বিজেপিই নয়, আরজেডি কিংবা জেডিইউ যে দল থেকেই হোক, বুর্জোয়া রাজনীতিতে আজ যাঁরা জনপ্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হচ্ছেন, তাঁদের বেশির ভাগেরই কোনও নীতি-আদর্শের বালাই নেই। ক্ষমতা এবং প্রচারের আলোয় থাকার জন্য কোনও নীতিহীন আচরণেই তাঁরা পিছু-পা নন। ফলে এমন একটি জোটের ক্ষমতায় বসার দ্বারা বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির রথকে আটকে দেওয়া গেল কী করে বলা যাবে!

বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সুবিধাবাদী বুর্জোয়া তথা ভোট রাজনীতিকে কিছুটা হলেও রুখতে দরকার বিকল্প বামপন্থী আদর্শ এবং রাজনীতি। বিকল্প হিসাবে দরকার এই জাতপাত সাম্প্রদায়িকতা দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটা প্রবল আদর্শগত সংগ্রাম। দরকার জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে নিয়ে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলা। দরকার বামপন্থীদের লাগাতার নিজস্ব কর্মসূচি। তবেই মানুষের কাছে বুর্জোয়া ভোট রাজনীতির বিকল্প উপস্থিত করা যাবে। সিপিএম-লিবারেশন কি বিহারে সেই রাজনীতির চর্চা করছে? তাদের চর্চিত রাজনীতিতে বিহারের মানুষ সেই রাজনীতির হদিশ পাননি। অথচ বুর্জোয়া রাজনীতির চুরি-দুর্নীতি, সরকারি সম্পত্তির অবাধ লুঠপাটের বিকল্প লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি ছাড়াই এই সব বামেরা নতুন জোট সরকারের কাছে 'অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি' চাইছেন এবং তা তারা বাস্তবায়িত করাবেন, এমন আকাশকুসুমের কথা হাওয়ায় ছেড়ে দিচ্ছেন। যারা এক সময় লেনিন থেকে প্রসঙ্গহীন ভাবে বিচ্ছিন্ন কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে পার্লামেন্টকে শুয়োরের খোঁয়াড় আখ্যা দিয়ে নির্বাচন বয়কট করার কথা বলেছিল, তারাই আজ আপাদমস্তক বুর্জোয়া ভোট এবং জোট রাজনীতির পাঁকে পাক খাচ্ছে।

সিপিএম-সিপিআইয়ের মতো বামপন্থী নামধারী দলগুলিও আজকের পচা দুর্গন্ধময় ভোট রাজনীতিতে পার্লামেন্ট-বিধানসভাগুলিতে কিছু সিট পাওয়ার উদগ্র বাসনায় নির্বিচারে বুর্জোয়া, জাতপাতবাদী দলগুলির সঙ্গে জোট করছে, তাদের জোট সরকারকে সমর্থন করছে। বামপন্থার যে স্বীকৃত রাজনীতি— শ্রেণিসংগ্রাম এবং গণসংগ্রামগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, শক্তিশালী করা, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তারা এখন এমএলএ-এমপি-র সংখ্যার নিরীখে নিজেদের অগ্রগতি প্রমাণে ব্যস্ত। এর সঙ্গে বামপন্থার কোনও সম্পর্ক নেই, লেনিনবাদের তো নেই-ই। সেই জন্যেই পশ্চিমবঙ্গে ভোটে একবার হারার পরেই একদা মহাপরাক্রমী সিপিএম নেতারা সোসাল মিডিয়ায় আস্ফালন ছাড়া জনগণকে সংগঠিত করে আন্দোলনের কথা ভাবতেই পারেন না।

বুর্জোয়াদের নিজস্ব নীতিতে চলা কোনও সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করে বামেরা তাদের নীতিকে কখনও প্রভাবিত করতে পেরেছে? কেন্দ্রে প্রথম ইউপিএ সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করেছিল সিপিএম এবং তার সহযোগী দলগুলি। অনেকেরই স্মরণে আছে, এ রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ব্রিগেডের এক সভায় বলেছিলেন, তাঁরা বসতে বললে ইউপিএ সরকার বসবে, উঠতে বললে উঠবে। দেশের মানুষের অভিজ্ঞতা, বাস্তবটা ছিল ঠিক তার বিপরীত। তাদের সমর্থন ইউপিএ সরকারের একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী নীতি গ্রহণে, পদক্ষেপে কোনও ব্যাঘাত ঘটাতে যেমন পারেনি, তেমনই দুর্নীতিতেও লাগাম পরাতে পারেনি। অবশ্য শ্রমিক শ্রেণির শ্রেণি সংগ্রামকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য ছাড়াই সিপিএম নেতৃত্বাধীন বাংলা কেরালা ত্রিপুরা— প্রতিটি সরকারই জনগণের স্বার্থ রক্ষার নামে শেষ পর্যন্ত দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থই রক্ষা করেছে। বিহারেও এর কোনও অন্যথা হওয়ার কারণ নেই।

বামপন্থা বর্জিত জোট রাজনীতি তথা ভোট রাজনীতি শোষিত মানুষের মুক্তি আন্দোলনের শক্তিকে বাড়ায় না, বরং তাকে আরও দুর্বল করে। এই দুর্বলতার পথ বেয়েই বিহারে সাম্প্রদায়িকতাবাদী বিজেপি জায়গা করে নিয়েছে। এই অবস্থায় বিজেপিকে শায়েস্তা করা গেল বলে নতুন জোটের পক্ষে যতই গলা ফাটানো হোক, বাস্তবে এর দ্বারা বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে পরাস্ত করা যাবে না। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে চাই বামমনস্ক সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে গণআন্দোলনের জোয়ার। ভোট রাজনীতির সুবিধাবাদ ছেড়ে লিবারেশন-সিপিএমরা সেই রাস্তায় হাঁটবেন কি?

অমৃত পেল কারা

একের পাতার পর

তরুণীকে, কাজ হারিয়ে দিশাহারা কোটি কোটি মানুষকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও হয়ত বেকারত্বের যন্ত্রণা ভোলানো যাবে। আকাশছোঁয়া দামে সার-বীজ-কীটনাশক কিনতে গিয়ে গলা পর্যন্ত ঋণে ডুবে থাকা চাষি ভুলবে ফসলের দাম না পাওয়ার দুশ্চিন্তা। কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিক, একশো দিনের কাজ না পাওয়া বিপুল সংখ্যক ঠিকাকর্মী, এমনকী পাচার হয়ে যাওয়া নারী— জীবনযন্ত্রণা ভুলিয়ে সকলকেই মাতিয়ে তোলা যাবে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে। দেশ জুড়ে বইয়ে দেওয়া যাবে খুশির হাওয়া।

খুশির হাওয়া নয় তো কী! অমৃতকালে অমৃতের কি ঘাটতি পড়েছে! দেশের অল্প কয়েকজন একচেটিয়া পুঁজিপতির ভাগ্যে দেদার অমৃত কি জোটেনি? আর কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মতে আদানি, আম্বানিদের মতো এইসব পুঁজিপতিরাই তো জগৎসভায় ভারতের মুখ! তাই অমৃতকালে নরেন্দ্র মোদি সরকারের বদান্যতায় কলসি কলসি অমৃত জুটেছে শুধু তাঁদেরই ভাগ্যে। আইনি কিংবা বেআইনি পথে দেদার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে তাঁদের। লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্কঋণ ও কর মকুব করা হয়েছে। গত পাঁচ বছরে পরিশোধ না করা ১০ লক্ষ কোটি টাকার বিপুল ঋণ ব্যাঙ্কের হিসেবের খাতা থেকে স্রেফ মুছে দেওয়া হয়েছে। প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকা ক্ষতি স্বীকার করেও কর্পোরেট করের হার ব্যাপক কমিয়ে দিয়েছে মোদি সরকার। ফলস্বরূপ গত দু'বছরে ভারতে ১০০ কোটি ডলার কিংবা তারও বেশি পরিমাণ সম্পদের মালিকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪২-এ। অমৃতকাল নয় তো আর কী!

মোদি সরকারের বদান্যতায় ফানুসের মতো আকাশছোঁয়া উত্থান হয়েছে শিল্পপতি আদানির। এই অমৃতকালেই এশিয়ার সবচেয়ে ধনী এই একচেটিয়া ব্যবসায়ীটি বিশ্বের ধনীতমদের মধ্যে চতুর্থ স্থানে পৌঁছেছেন। কেন্দ্রে মোদি শাসনের প্রথম চার বছরেই প্রধানমন্ত্রীর পরম স্নেহধন্য আদানির সম্পদ চারগুণেরও বেশি বেড়ে প্রায় ১২০০ কোটি ডলারে ঠেকেছিল। সরকারের কাছ থেকে আদানি কী কী সুবিধা পেয়েছেন, তার তালিকা তৈরি করলে থই পাওয়া যাবে না। প্রধানমন্ত্রী যেসব দেশে সফর করেছেন, সফরসঙ্গী আদানি সেইসব দেশের নানা সংস্থার সঙ্গে প্রতিরক্ষা, লজিস্টিক্স ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবসার জন্য ১৫টিরও বেশি চুক্তি করেছেন। দেশের ব্যাঙ্ক কম সুদে বিপুল পরিমাণ ঋণের জোগান দিয়ে গেছে তাঁকে। পুঁজিপতিদের সুবিধা দিতে নরেন্দ্র মোদি সরকারে বসার দু'মাসের মধ্যে সরকারি ব্যাঙ্কগুলি ধার শোধের সময়কাল ১৫ বছর বাড়িয়ে দেয়। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আদানির কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে ৫ হাজার কোটি টাকা কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিল ডায়রেক্টরেট অফ রেভেনিউ ইনটেলিজেন্স (ডিআরআই) দপ্তর। এ নিয়ে মামলাও দায়ের হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে ২০১৭ সালে হঠাৎ দেখা গেল ডিআরআই কর্তৃপক্ষ আদানির বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা তুলে নিয়েছে। আদানির জন্য বিজেপির এ হেন শাসনকাল যদি 'অমৃতকাল' না হয়, তা হলে তা আর কী হতে পারে!

এই অমৃতকালেই দুনিয়ার ধনকুবেরদের মধ্যে ১১ নম্বরে থাকা মুকেশ আম্বানির দৈনিক আয় ১২২ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রথম পাঁচ বছরেই আম্বানি নিজের সম্পদের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। মূলত রিলায়্যান্স জিও-র ব্যবসাতেই এ হেন অমৃতলাভ আম্বানির। সেই ব্যবসা বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর অবদান কি ভোলার মতো! সমস্ত রীতিনীতি অগ্রাহ্য করে জিও-র বিজ্ঞাপনে নিজের ছবি ব্যবহার করতে দেওয়া থেকে টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া-র ওপর প্রভাব খাটিয়ে আম্বানির ব্যবসায় বিপুল সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া— প্রিয় ধনকুবের মিত্রটির জন্য কী না করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী! আম্বানিদের জন্য সত্যিই তিনি এনে দিয়েছেন 'অমৃতকাল'।

এমনকি কোভিড অতিমারির ভয়ানক সময়টাকেও বিজেপি সরকার চমৎকার ভাবে ব্যবহার করেছে হাতে-গোনা পুঁজিপতিদের সিন্দুক ভরাতে। ১৪টি সরকারি সংস্থাকে বসিয়ে রেখে মাত্র দুটি ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানিকে টিকা তৈরির বরাত দিয়ে তাঁদের জন্য বিপুল মুনাফার বন্দোবস্ত সরকারি ভাণ্ডার থেকেই করে দিয়েছে তারা। এয়ার ইন্ডিয়ার ঋণের বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে সংস্থাটিকে তুলে দিয়েছেন টাটাদের হাতে। ফলে আদানি, আম্বানি, টাটারা ছাড়াও শিব নাদার, সাইরাস পুনাওয়ালা, রাধাকিসান দামানি, লক্ষ্মী মিত্তাল, সাবিত্রী জিন্দাল, কুমার বিড়লা, উদয় কোটাকের মতো ভারতীয় ধনকুবেররা বিশ্বের শতকোটি ডলারের মালিকদের তালিকায় অবলীলায় নিজেদের নাম বজায় রাখতে পেরেছেন। কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের বদান্যতায় অমৃতের ভাগ তো এঁরাই পেয়েছেন!

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ চরম গরিবি-বেকারি-অশিক্ষা-চিকিৎসাহীনতায় ডুবে জীবনযন্ত্রণার গরলে জর্জরিত হয়ে অসহনীয় জীবন কাটাবে, আর ধনীতম অল্প কয়েকজন বৈভবের চূড়ায় বসে সম্পদের অমৃত পান করবে— এটিই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে অমৃত-গরলের ভাগ-বাঁটোয়ারা। সুষ্ঠু ভাবে যাতে এই বন্দোবস্ত চলে তা নিশ্চিত করার কাজটি করে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির রাজনৈতিক ম্যানেজার সরকার। ঠিক সেটাই করে চলেছে কেন্দ্রের বর্তমান নরেন্দ্র মোদি সরকার। তাই দেড় লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি স্বীকার করেও শিল্পপতিদের অবলীলায় কর ছাড় দেওয়া হয়। অথচ কাজ হারিয়ে মানুষ দু'বেলা খেতে পাবে না জেনেও এক কোপে বিপুল পরিমাণ বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা প্রকল্পে। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের নাম করে মহা-জৌলুসের এই আয়োজন সেইসব না খেতে পাওয়া মানুষের কান্না জোর করে চাপা দিতেই নয় কি!

দুর্নীতিতে কে কম যায়

একের পাতার পর

দেখে নেওয়া যাক কোন দলের শাসনে দুর্নীতির সাগরে ভাসা হিমশৈলের উপরের মাপটা কেমন!

বিজেপি

সর্বোচ্চ ঘুষখোর প্রশাসন ঃ 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল'-এর সমীক্ষা বলছে, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর 'এশিয়ার সর্বোচ্চ ঘুষখোর' প্রশাসনের তকমা পেয়েছে ভারত। সরকারি দপ্তর থেকে কোনও সার্টিফিকেট, রেজিস্ট্রেশন, ন্যায্য সুবিধা, স্কুল-কলেজে ভর্তি ইত্যাদির ৮৭ শতাংশ ক্ষেত্রেই ঘুষের টাকা তৈরি রেখে দরখাস্ত করতে হয়। এই প্রবণতা ক্রমাগত বাড়ছে। (দ্য ওয়্যার, ৯ ডিসেম্বর, ২০২০) বিজেপি শাসনে সরকারি দপ্তরে আরটিআই করে তথ্য জানতে পারা বিরল হয়ে উঠছে। ফলে সরকারি কাজের স্বচ্ছতা কমছে। (ওই)

কর্ণাটকের খনি কেলেঙ্কারি ঃ জমি এবং খনি কেলেঙ্কারির একাধিক ঘটনায় বিজেপি নেতা ইয়েদুরাপ্পা ও রেড্ডি ভাইরা অভিযুক্ত। ৩৬ হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ। বিজেপির শীর্ষ স্তরের নেতা, পুলিশ, আমলা, বিচারক, সরকারি আইনজীবীদের ঘুষ দিয়ে বেআইনি কারবার ফাঁদার অভিযোগ একাধিক মামলায় আছে। কিন্তু সিবিআই নাকি কিছুতেই কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছে না! তাই 'প্রমাণ নেই' বলে ফাইল ধামাচাপা!

আসামের 'লুইস বার্জার' জলপ্রকল্প কেলেঙ্কারি ঃ এক সময় অমিত শাহের নামে প্রচারিত লিফলেটে আসামের জলপ্রকল্প সংক্রান্ত লুইস বার্জার কেলেঙ্কারির জন্য বিজেপি যাঁকে অভিযুক্ত করেছিল, সেই হিমন্ত বিশ্বশর্মা এখন বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর আসন আলো করছেন। অভিযোগ গোয়াতে এই কোম্পানির বিরুদ্ধে তদন্তে সিবিআই এগোলেও আসামে পৌঁছলেই তাদের পা যেন আর চলতে চায় না!

ব্যাপম কেলেঙ্কারি ঃ মধ্যপ্রদেশে সরকারি চাকরি ও মেডিকেল কলেজে ভর্তি সংক্রান্ত দুর্নীতিতে কমপক্ষে ২০০ কোটি টাকার ঘুষের কারবার হয়েছে। এর প্রতিবাদ করে এবং খোঁজ নিতে গিয়ে একাধিক সাংবাদিক সহ প্রায় ৩৩ জন মানুষের রহস্যমৃত্যু ঘটেছে। মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, বিজেপির শিবরাজ সিং চৌহান। কোনও শাস্তি হয়নি।

ছত্তিশগড়ের রেশন কেলেঙ্কারি ঃ ৩৬ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ২০১৩ থেকে ২০১৬-র মধ্যে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ সিং বাঘেলার আমলে। কোথায় সিবিআই?

এছাড়াও রাজস্থানে বিজেপি সরকারের আমলে ৪৫ হাজার কোটি টাকার খনি দুর্নীতি, ওই রাজ্যেই বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর নামে ঢোলপুর প্যালেস দখলের অভিযোগ, ললিত মোদি, নীরব মোদি, মেহুল চোক্সি, বিজয় মালিয়া ইত্যাদি ব্যাঙ্ক লুঠেরা ও জালিয়াতদের সাথে বিজেপির নেতাদের দহরম মহরম কেউ অস্বীকার করতে পারে না। গুজরাট স্টেট পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনে দুর্নীতি, আদানি পাওয়ারকে বাড়তি ৫০ হাজার কোটি টাকা পাইয়ে দেওয়ার দুর্নীতি, রাফাল দুর্নীতি, বালকো দুর্নীতি, ডাল দুর্নীতিতে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা গায়েব, ন্যানো কারখানার জমি নিয়ে গুজরাটে ৩৩ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি— এরকম অজস্র আছে।

সম্প্রতি অযোধ্যার রামমন্দিরের জমি নিয়েও দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সেই বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গে নারদা, সারদা কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতারা বিজেপিতে নাম লেখানোর পর সিবিআই ইডির চোখে কেমন করে অদৃশ্য হয়ে আছেন সেটাও বেশ রহস্যের। নোট বাতিলের পর গুজরাট থেকে বিজেপির প্রাক্তন এমএলএ শচীন ওঝা ওই রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্ক ও বিজেপির উঁচুতলার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী কোনও পদক্ষেপ নিয়েছেন?

কংগ্রেস

১৯৪৭ এ স্বাধীনতার পর থেকে ২০১৯ পর্যন্ত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যত দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তার সম্মিলিত পরিমাণ ৪ লক্ষ ৮২ হাজার কোটি টাকারও বেশি। (জিনিউজ ২২.০৮.২০১৯) এর মধ্যে বহুল প্রচারিত কেলেঙ্কারিগুলি হল— ১৯৪৮-এ জওহরলাল নেহেরুর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে সেনাবাহিনীর জিপ কেলেঙ্কারি। ১৯৭৫-এ ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনে ঘুষ কেলেঙ্কারি, ১৯৭৬-এ তেল কেলেঙ্কারি, যাতে ইন্দিরা গান্ধী ও সঞ্জয় গান্ধী যৌথভাবে অভিযুক্ত। ১৯৯৭ এ রাজীব গান্ধীর আমলে বোফর্স কেলেঙ্কারি, ২০০৭-এ আইএনএক্স মিডিয়া কেলেঙ্কারি, ২০০৮-এ টুজি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি, ২০০৯-এ সত্যম কেলেঙ্কারি, ২০১০-এ কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারি, ২০১২-এ কয়লা কেলেঙ্কারি, হেলিকপ্টার ও টেট্রা ট্রাক কেলেঙ্কারি, আদর্শ আবাসন কেলেঙ্কারি, শেয়ার কেলেঙ্কারি ইত্যাদি। এখন ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কতটা কাজ করছে আর বাস্তব দুর্নীতি কতটা তা সময়ই বলতে পারবে।

তৃণমূল কংগ্রেস

চিটফান্ড ও নারদা কেলেঙ্কারি ঃ ২০১৩ সালে সারদা কেলেঙ্কারি সামনে আসার পর রোজ ভ্যালি ইত্যাদি নানা চিটফান্ডও তদন্তের মুখে পড়েছে। কিছু চিটফান্ড কর্তা ও তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন। প্রথমে সিআইডি, পরে সিবিআই তদন্ত চলছে। কিন্তু দ্রুত বিচার শেষ করে দোষীদের শাস্তি বা আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার কথা যেন সকলে ভুলেই গেছে। নারদ সংস্থার চালানো স্টিং অপারেশনে তৃণমূলের একধিক সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী, ঘনিষ্ঠ পুলিশ অফিসার টাকা নিতে গিয়ে ছবিতে ধরা পড়েছেন। এর তদন্তটাই যেন রহস্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এর আগে ত্রিফলা আলো কেলেঙ্কারির কোনও কিনারা হয়নি। সম্প্রতি নিয়োগ দুর্নীতির বিস্ফোরণ ঘটেছে। বালি, কয়লা ও গরু পাচার কেলেঙ্কারি নিয়ে হইচই চলছে। এরও পরিণতি কী হবে, সত্যিই নিরপেক্ষ তদন্ত হয়ে দোষীরা শাস্তি পাবে, নাকি এই তদন্তও আসলে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার হাতিয়ারে পরিণত হবে? এটাই মানুষের প্রশ্ন।

সিপিএম

সিপিএমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্বের শেষ বেলায় 'মালায়লা মনোরমা' পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, আমরা দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু তাঁরা শুনছেন না। তাঁর কথায়, সিপিএম নেতারা স্থানীয় রাজা হয়ে উঠেছেন (দ্য হিন্দু, ২৫.০২.২০১১)। ওই বছর ডিসেম্বরে কৃষ্ণনগরে দলের সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, ব্যাপক দুর্নীতির জন্যই আমরা হেরেছি (হিন্দুস্তান টাইমস, ১৯.১২.২০১১)।

সিপিএম আমলে বহু আলোচিত ১৯৮০-র দশকে বেঙ্গল ল্যাম্প কেলেঙ্কারি। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ঘনিষ্ঠদের মালিকানায় চলা বেঙ্গল ল্যাম্প কোম্পানির উচ্চপদস্থ ছিলেন তাঁর পুত্র। সেই কোম্পানি সরকারের থেকে অন্যায়ভাবে বিশেষ সুবিধা পেয়েছিল। এই তথ্য ফাইল থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী মানতে না চাওয়ায় তাঁকে মন্ত্রিসভা ত্যাগ করতে হয়।

এ ছাড়া ওয়াকফ কেলেঙ্কারি, ট্রেজারি কেলেঙ্কারি, পার্সোনাল লেজার অ্যাকাউন্ট কেলেঙ্কারি এগুলি তো আছেই। সারদা কেলেঙ্কারির বীজ পোতা হয়েছিল সিপিএম নেতাদের হাত ধরেই। সঞ্চয়িতা চিটফান্ড কেলেঙ্কারির কথাও সহজে ভোলার নয়। এছাড়াও সে সময় শাসকদলের স্থানীয় নেতারা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মৌরসী পাট্টা গেড়ে থাকা নেতারা কী পরিমাণ দুর্নীতি করেছেন, তা আজও বহু মানুষের অভিজ্ঞতায় জ্বলজ্বল করছে। পঞ্চায়েতগুলি এই সময়েই দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। যা আজ আরও ব্যাপক রূপ নিচ্ছে। শাসকদলগুলি সকলেই তাই বিরোধী আসনে থাকার সময় অন্যের দিকে আঙুল তোলে, বলে ওর থেকে আমাদের দুর্নীতি কম ছিল।

রামমন্দির নিয়েও দুর্নীতি বিজেপির

'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা'— বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মেহুল ভাই, ললিত মোদি, নীরব মোদি, বিজয় মালিয়ার মতো অনেকেই বেশ আয়েস করে হাজার কোটি, শত কোটি টাকা খেয়ে নিশ্চিন্তে বিদেশে উড়ে গেছেন। এ পর্যন্ত জানা ছিল। কিন্তু তিনি ক্যামেরা সাক্ষী রেখে সটান শুয়ে পড়ে যে রামমন্দিরের শিলান্যাসকে একেবারে দেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা বললেন— তারপর সেই মন্দিরের জমি নিয়ে চলছে দুর্নীতি! তাও করছেন তাঁরই দলের লোকেরা! অবাক হওয়ার কিছু নেই। 'অতিভক্তি'-র লক্ষণ যে কিসের ইঙ্গিত তা তো প্রবাদেই আছে!

জানা গেছে, অযোধ্যায় বিজেপির মেয়র ঋষিকেশ উপাধ্যায়, বিজেপি বিধায়ক বেদপ্রকাশ গুপ্ত, প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক গোরক্ষনাথ বাবা সহ অন্যান্যরা জমি কেনাবেচা কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত। এ অভিযোগ বিরোধীদের নয়। অযোধ্যা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মন্দিরের জমি কেনাবেচায় দুর্নীতি, অর্থপাচার এবং বেআইনি নির্মাণে অভিযুক্ত ৪০ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে। সেই তালিকায় রয়েছেন বাঘা বাঘা ওই নেতারা।

সুপ্রিম কোর্ট ২০১৯ সালে অযোধ্যার বিতর্কিত স্থানে মন্দির করার পক্ষে রায় দিলে বিজেপি নেতারা জয়ের জন্য দেশজুড়ে উৎসবে মেতেছিলেন। সত্যিকারের ধর্মপ্রাণ মানুষ কিন্তু বুঝেছিলেন এটা ধর্ম নয়— ভোট ব্যবসা। বাবরি মসজিদ ভাঙার ২৩ দিন পরে ওই ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব মাধব গোডবোলে বলেছিলেন, 'যদিও আমি একজন ধর্মবিশ্বাসী মানুষ, তবুও ...সেদিন অযোধ্যায় আমি কোনও টান অনুভব করিনি। মন থেকে অনুভব করেছি শঠতা, প্রতারণা আর ভয়াবহ হিংসার জোরে তৈরি মন্দিরে আমার দেবতা বাস করতে পারেন না'(আনফিনিশড ইনিংস)। ভোট ব্যবসা জমিয়ে নিয়ে এবার এই ধর্মব্যবসায়ীরা নেমেছেন মন্দিরের জমি লোপাট করে নিজেদের পকেট ভরানোর কাজে। মন্দিরের নামে পর্যটন ও হোটেল ব্যবসা করার জন্য আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দর তৈরির চেষ্টা চলছে। মন্দির করার জন্য জনসাধারণ জমি দান করেছিলেন। সেই জমি একর প্রতি ১৮.৫০ কোটিতে বিক্রি হচ্ছে।

দুর্নীতির খবর কি বিজেপি শীর্ষ নেতাদের অজানা ছিল? না। গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির স্থানীয় সাংসদ লাল্লু সিংহ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে চিঠি দিয়ে এ বিষয়ে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন। ২০২১ সালে জমি দুর্নীতি নিয়ে হইচই হতেই রাম জন্মভূমি ট্রাস্ট 'স্বচ্ছতার' ব্যাপারে বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

তাহলে তদন্ত হল না কেন? 'স্বচ্ছ' বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী তদন্ত করালেন না কেন? তিনি কি কেচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে পড়ার আশঙ্কা করছেন? আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কিংবা অমিত শাহই বা চুপ করে থাকলেন কেন? এই যে খেতে দিচ্ছেন— তা নিজেদের খাওয়াটাকে নিশ্চিত করে নেওয়ার জন্যই নয় কি! খেয়ে চলেছেন তো তাঁরা সর্বত্রই।

মধ্যপ্রদেশের পরীক্ষা কেলেঙ্কারি 'ব্যাপম'এর কথা মনে আছে? কোটি কোটি টাকার ওই কেলেঙ্কারি চাপা দিতে ৩৩ জনকে খুন করেছিল স্বার্থান্বেষী চক্র— পরীক্ষার্থী, সাংবাদিক থেকে বিচারপতি কেউ বাদ যাননি ওই ভয়ঙ্কর ক্ষমতাশালী চক্রের হাত থেকে। কোনও অদৃশ্য হাতের জাদুকাঠিতে একজনও ধরা পড়েনি, শাস্তি তো দূরের কথা। কর্ণাটকে রেড্ডি ভাইদের খনি কেলেঙ্কারি, ইয়েদুরাপ্পার জমি কেলেঙ্কারি, কার্গিলে কফিন কেলেঙ্কারি সহ অজস্র দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর কবজায় থাকা পিএম কেয়ার ফান্ডের হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির কথা আজ আর দেশের মানুষের অজানা নয়। ইডি, সিবিআইয়ের চোখে বিজেপি এতই পবিত্র নাম যে, এ দলের স্ট্যাম্প গায়ে থাকলে তারা চোখ বুজে ফেলে। এখন অযোধ্যায় ধর্মকে পুঁজি করে দুর্নীতিতে মেতেছে তারা। কলিকাল আর কাকে বলে! বিজেপির মন্দির যে ধর্মের নয়, তা আসলে ভোটের, করে খাওয়ার জায়গা— অযোধ্যার জমি কেলেঙ্কারির ঘটনা সে কথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ নয় কি?

সর্বনাশা এনএমসি বাতিলের দাবিতে মেডিকেল ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল

এমবিবিএস কোর্সে অবৈজ্ঞানিক 'নেক্সট' পরীক্ষা বাতিল, সিবিএসই পাঠক্রম বন্ধ করা, এমবিবিএস ইন্টার্নশিপে আয়ুশ পোস্টিং না করা, মেডিকেল শিক্ষার গৈরিকীকরণ বন্ধ করা প্রভৃতি দাবিতে ১২ আগস্ট এআইডিএসও-র উদ্যোগে বিক্ষোভ দেখায় দেড় শতাধিক মেডিকেল ছাত্র। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু হওয়া এই মিছিলে দাবি ওঠে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ এবং মেডিকেল শিক্ষায় এর ভয়ঙ্কর রূপ ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন বাতিল করতে হবে। মিছিল শেষে কমিশনের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়।

এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি ডাঃ মৃদুল সরকার, রাজ্য সভাপতি কমরেড সামসুল আলম ও সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ডাঃ শুভঙ্কর চ্যাটার্জি বক্তব্য রাখেন।

সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য ডাঃ দীপক গিরির নেতৃত্বে ৪ জনের এক প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছে স্মারকলিপি দেয়। তিনি সমস্ত দাবি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরার আশ্বাস দেন। তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় যেমন— পরীক্ষা ও খাতা রিভিউ এর সমস্যা, বিএইচএমএস-এ রেগুলার ক্লাসের সমস্যা, ডেন্টাল ও প্যারামেডিক্যাল ছাত্রদের নিয়মিত নিয়োগ সমস্যা সমাধান, প্যারামেডিক্যাল ও নার্সিংয়ে স্টাইপেন্ড সমস্যা সমাধান, প্যারামেডিক্যাল ব্যাচেলর কোর্সে স্টাইপেন্ড ও টিআর প্রক্রিয়া চালু করার আশ্বাস দেন।

দাবি আদায়ের আন্দোলনে জয়ী আশাকর্মীরা

মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা সহ নানা সরকারি কাজ করানো হয় আশাকর্মীদের দিয়ে। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা তাদের কোনও ছুটি নেই। গ্রামীণ প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা পুরোপুরি নির্ভর করে রয়েছে তাঁদের উপর, অথচ তাঁদের কাজের কোনও স্বীকৃতি নেই। তাঁরা ভাতা পান নামমাত্র। কেন্দ্র-রাজ্য কোনও সরকারেরই তাদের নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। তাঁদের সীমাহীন বঞ্চনা নিরসন এবং সরকারি কর্মী হিসাবে স্বীকৃতির দাবিতে আশাকর্মীরা স্বাস্থ্যভবনে এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে বারবার ডেপুটেশন দিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই মেলেনি।

২৯ জুলাই এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্বে জেলায় জেলায় ৪৫-৫০ হাজার আশাকর্মী আন্দোলনে নেমেছেন। এর ধারাবাহিকতায় ৩ আগস্ট আশাকর্মীরা রাজ্যজুড়ে স্বতঃস্ফূর্ত ও অভাবনীয় কর্মবিরতি পালন করেছেন। আন্দোলনের চাপে স্বাস্থ্যভবন আশাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হওয়ায় ৪ আগস্ট কর্মবিরতি প্রত্যাহার করা হয়। কর্তৃপক্ষ বৈঠকে আগামী মাস থেকেই ইন্সেন্টিভ-এর টাকা ভাগে ভাগে পাঠানো বন্ধ করা এবং সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এ ছাড়াও মোবাইল ফোন দেওয়া, রিচার্জের জন্য মাসিক ২০০ টাকা দেওয়া এবং অন্যান্য দাবিগুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখার প্রতিশ্রুতি দেন।

বিজেপির দাক্ষিণ্যেই আদানি বিশ্বের চতুর্থ সম্পদশালী

এ কেমন স্বাধীনতা! ভারতের ৭১ শতাংশ নাগরিক, সংখ্যার হিসেবে ৯৭ কোটি সুষম খাদ্য থেকে বঞ্চিত। রাষ্ট্রপুঞ্জের 'ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন'-এর এক সমীক্ষায় সম্প্রতি এই বিস্ফারক তথ্য জানা গেছে। এই রিপোর্ট প্রকাশের পক্ষকাল পরেই ফোর্বস তালিকায় দেখা গেল, মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসকে পিছনে ফেলে বিশ্বে চতুর্থ সম্পদশালী হিসাবে উঠে এসেছেন নরেন্দ্র মোদি সরকারের অতিঘনিষ্ঠ আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানি। তার বর্তমান সম্পদের পরিমাণ ১১৬ বিলিয়ন ডলার। ফোর্বস তালিকায় প্রকাশিত এই খবর দেখে গর্বিত বিজেপি নেতারা বলতে পারেন, আর মাত্র তিনজন—টেসলার এলন মাস্ক, লুইস ভুইটোর বার্নার্ড আরনল্ট এবং আমাজনের জেফ বেজোসকে হারাতে পারলেই হল, ভারত—মানে ভারতের পুঁজিপতি একেবারে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনটি পাবে! সৌজন্যে মোদি-অমিত শাহের বিশ্বস্ত বন্ধু আদানি।

কাজের খোঁজে গুজরাট থেকে মুম্বইয়ে এসে হিরে ব্যবসা দিয়ে যার আয়ে হাতেখড়ি, সেই আদানির এই বিপুল সম্পদবৃদ্ধি কীভাবে? এর পেছনে রয়েছে শাসক বিজেপির আশীর্বাদ। দেশের সাধারণ মানুষকে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে বিজেপি সরকার একচেটিয়া পুঁজিপতি আদানিকে লুটপাট চালানোর অবাধ ছাড়পত্র দিয়ে এসেছে লাগাতার। জমি, বন্দর, কয়লা, খনি, জ্বালানি তেল, বিদ্যুৎ, টেলিকম, চাল-ভোজ্য তেল সহ নানা খাদ্যদ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার দিয়েছে তাদের। অক্টোপাসের মতো সমস্ত দিক থেকে আস্টেপৃষ্ঠে মুনাফা-লালসা পূরণে ঝাঁপিয়ে পড়ে আদানি গোষ্ঠী। অনলাইন, ফ্র্যাঞ্চাইজি, এজেন্সির মাধ্যমে দেশের সর্বত্র খুচরো এবং পাইকারি ব্যবসায় এবং লক্ষ লক্ষ কাউন্টার খুলে এক বিশাল চেনের মাধ্যমে এই সব ব্যবসার একচেটিয়া দখল নেয় তারা। প্রায় সমস্ত বন্দর সহ বহু রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সরকার জলের দরে তুলে দিয়েছে আদানির হাতে। এজন্য কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতারা কতটা কাটমানি পেয়েছেন তা নিয়ে তদন্ত না হলেও সরকারের 'বদান্যতায়' লাভের অঙ্ক বাড়তে থাকে আদানিদের, বিলিওনিয়ারের সাম্রাজ্যে সম্রাটের স্থান দখল করে অতি দ্রুত।

শুধু দেশের বাজারেই নয়, বিদেশেও— যেমন ইজরায়েলে বন্দর, অস্ট্রেলিয়ায় খনি, শ্রীলঙ্কায় বিদ্যুৎ ব্যবসার বরাতও মোদি সরকার পাইয়ে দেয় আদানিকে। অস্ট্রেলিয়ায় আদানির খনি কেনার জন্য সরকারি ঋণ পাইয়ে দিতে স্টেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল বিজেপি সরকার। অস্ট্রেলিয়া এবং শ্রীলঙ্কা দু'দেশের সাধারণ নাগরিক ভারতীয় পুঁজিপতি আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। স্লোগান উঠছে, 'আদানি গো ব্যাক', 'খনি-বিদ্যুৎ থেকে হাত ওঠাও'। আদানিদের সেবা করার মাশুল দিতে হচ্ছে ভারতের জনগণকেও। দেশে বিপুল কয়লার ভাণ্ডার মজুত থাকা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়া থেকে আদানির কয়লা ১০ গুণ বেশি দামে কিনে ভারতে আমদানি করছে মোদি সরকার। এই আমদানির কোনও প্রয়োজন ছিল না। আদানির মুনাফা বাড়াতে এইভাবে বেশি দাম দিয়ে কয়লা কিনে ভারতে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে মোদি সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। পরিণামে সাধারণ মানুষকে বিপুল পরিমাণে বিদ্যুৎ বিল মেটাতে হচ্ছে। এইভাবে সরকারের সৌজন্যে জনগণের পকেট কেটে আদানিদের সম্পদ বৃদ্ধি চলছে।

বিজেপির 'দাক্ষিণ্যে' আদানির সম্পদবৃদ্ধি ঘটতে থাকে অতি মসৃণ গতিতে। গত দু'বছরে করোনা অতিমারিতে যখন জনজীবন বিপর্যস্ত, দেখা গেল তখনই আদানি গোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি লাভ করেছে। ২০২১ সালেই শুধু তাদের সম্পদবৃদ্ধি হয়েছে ৪৯ বিলিয়ন ডলার, প্রতি সপ্তাহে ৬ হাজার কোটি টাকা হারে (তথ্য-হুরুন)। ২০২২-এ এখনও পর্যন্ত তাদের সম্পদ বেড়েছে ৪৫ শতাংশ অর্থাৎ ৩৪ বিলিয়ন ডলার। সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় জনগণের সম্পত্তির অবাধ লুঠ ছাড়া এমন আর্থিক বৃদ্ধি সম্ভব নয়। শুধু জনগণের সম্পত্তি নয়, ড্রাগ ব্যবসাতেও নাম রয়েছে তাদের। আদানি পরিচালিত গুজরাটের মুন্দ্রা বন্দরে ৩০ হাজার কোটি টাকার ড্রাগ ধরা পড়েছিল, পরে আরও একবার ধরা পড়ে। কোনওটিরই তদন্ত হয়নি বিজেপি সরকারের বদান্যতায়!

যে কথাটা সাধারণ মানুষকে বুঝতে হবে, শ্রমিক-মেহনতি মানুষের শ্রম শোষণ করে, দেশের সম্পদের লুটপাট চালিয়েই আদানির মতো পুঁজিপতিরা সম্পদের পাহাড় বানায়। এর অনিবার্য পরিণামে দেশের ৯৭ কোটি মানুষ সুষম খাদ্য থেকে বঞ্চিত। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ১১৬টি দেশের মধ্যে ১০১তম স্থানে ভারত, প্রতি ৩৬টি শিশুর একজনের মৃত্যু হয় প্রথম জন্মদিনের আগেই। এগুলি স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষের পালকে এক একটা কৃষ্ণ বিন্দু। স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে যে পুঁজিবাদী শাসন কায়েম হয়েছে আদানিরা তার সুফল লুটেছে। আর লক্ষ লক্ষ মানুষ থালা হাতে ভিক্ষা করে পথের ধারে।

গোয়ালপোখরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন

উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর ব্লকের গোয়াগাঁও পঞ্চায়েতে চলছে চরম দুর্নীতি। উন্নয়নমূলক সব কাজে লক্ষ লক্ষ টাকা তছরূপ হয়েছে। এই চরম দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছে সংগ্রামী গণমঞ্চ।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর দেওয়ার নাম করে উপভোক্তাদের থেকে প্রচুর টাকা ঘুষ নেওয়া হয়েছে। প্রকৃত প্রাপকরা ঘর পাননি। ১০০ দিনের প্রকল্পে পুকুর না কেটে, মন্দির-মসজিদ-বিদ্যালয় সংস্কার, ক্যানেল সংস্কার, বৃক্ষরোপণ না করেই লক্ষ লক্ষ টাকা তছরূপ করা হয়েছে। পঞ্চায়েত গরিব মানুষের কাছ থেকে শৌচালয়ের জন্য ৯০০ টাকা করে সংগ্রহ করলেও কোনও শৌচালয় দেয়নি। সরকারি টাকায় পঞ্চায়েত সদস্যরা বাড়িতে কমিউনিটি টয়লেট করে নিয়েছেন। পঞ্চায়েতের অবহেলায় স্থানীয় নাগরিকরা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। ১০ হাজার জবকার্ড ওয়ার্কারকে নিষ্ক্রিয় রেখে মাত্র ২৬৪৮ জনকে অ্যাকটিভ রেখেছে পঞ্চায়েত। আরটিআই অ্যাক্ট ২০০৫-এর মাধ্যমে নাগরিকরা বারবার এ সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাইলেও তাদের জানানো হয়নি। এর বিরুদ্ধে ৯ আগস্ট গোয়াগাঁও বাজারে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকরা অবস্থানে বসেন। এতে ক্রুদ্ধ তৃণমূল দুষ্কৃতীরা আন্দোলনকারীদের উপর হামলা চালায়। কিন্তু গণপ্রতিরোধে তারা পিছু হটে। ১৭ আগস্ট পঞ্চায়েত ডেপুটেশনের ডাক দিয়েছে সংগ্রামী মঞ্চ।

কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ
অনুষ্ঠান শুরু রাজ্যে রাজ্যে

মুম্বাইয়ের সভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দ্বারিকা রথ

ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলায় মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রে বক্তব্য রাখছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ

অন্ধ্রপ্রদেশের সভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কে উমা।

(ডানদিকে) মালদার জনসভা। (ইনসেটে) ভাষণরত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল।

‘ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীদেরই লড়াই’
ইউক্রেন কমিউনিস্ট পার্টি

ইউক্রেন সরকারের দ্বারা নিষিদ্ধ ইউক্রেনের কমিউনিস্ট পার্টি ‘দ্য ইউনিয়ন অফ কমিউনিস্টস ইউক্রেন’ (ইউসিইউ)-এর মতে, রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ হল দুটি সাম্রাজ্যবাদী জোটের দ্বন্দ্বের পরিণাম। যার একটির নেতৃত্ব দিচ্ছে আমেরিকা, অপরটির রাশিয়া। উভয় জোট যুদ্ধের যে কারণগুলি দেখাচ্ছে তার তীব্র বিরোধিতা করেছে ইউক্রেনের কমিউনিস্ট পার্টি।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাশিয়া যে বলছে, এই যুদ্ধ ‘রাশিয়ার জনগণের স্বার্থে’, ‘ইউক্রেনে বসবাসকারী রুশভাষী জনগণের সুরক্ষার স্বার্থে’ বা ‘ইউক্রেন রাষ্ট্রের নাৎসিকরণ রুখতে’— ইউসিইউ তা নস্যাৎ করছে। ইউসিইউ-র মূল্যায়ন, রাশিয়ার পুঁজির স্বার্থেই এই যুদ্ধ, যার মধ্য দিয়ে বিশ্বে উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতিতে রাশিয়া তার পুঁজির বৃদ্ধি এবং অধিক মুনাফার সুযোগ তৈরির চেষ্টা করছে।

অন্যদিকে ইউক্রেন সরকারের বক্তব্য, এই যুদ্ধ ইউক্রেনীয় জাতির স্বার্থে, ইউক্রেনীয় ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে। এই বক্তব্যকেও সঠিক মনে করে না ইউক্রেনের কমিউনিস্ট পার্টি। তাদের বক্তব্য, আমেরিকার নেতৃত্বে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউক্রেন এবং উত্তর আমেরিকার পুঁজিপতিদের দ্বারা সংগঠিত এই যুদ্ধের লক্ষ্য—রুশ পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া। ইউক্রেনীয় জনগণের স্বার্থ বা অধিকার আদৌ এই যুদ্ধে বিবেচনাধীন নয়। বরং এই যুদ্ধে ইউক্রেনের সাধারণ মানুষের স্বার্থই বিপন্ন হচ্ছে এবং তারাই ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

এই যুদ্ধে ইউক্রেন এবং রাশিয়া—উভয় দেশের শ্রমিকদের সরকার নির্ধারিত একটাই অধিকার ও কর্তব্য পালন করতে হচ্ছে, তা হল, সম্মুখ সমরে যোগ দেওয়া এবং প্রাণ দেওয়া, যাতে বিশ্ব পুঁজিপতিদের একটি গোষ্ঠী পুঁজিপতিদের অপর একটি গোষ্ঠীকে পরাজিত করতে পারে এবং নিজ দেশ এবং বিজিত দেশের শ্রমিকশ্রেণির উপর শোষণ নিপীড়ন চালানোর একচেটিয়া অধিকার করায়ত্ব করতে পারে।

এই যুদ্ধের থেকে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণির পাওয়ার কিছু নেই। বরং এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সব দেশের সর্বহারা শ্রেণির জীবনে বিপর্যয় নামিয়ে এনেছে। এই যুদ্ধের পরিণাম— ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকারত্ব, বেতনহ্রাস, যা ইতিমধ্যেই বিশ্বের সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। জ্বালানি ও খাদ্যপণ্যের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ পরিণাম। এর ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি মুদ্রাস্ফীতি কমানোর নামে মুদ্রার সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করবে। এর সম্ভাব্য পরিণাম হল, অর্থনীতি মন্দায় নিমজ্জিত হবে, যা বিশ্বব্যাপী শ্রমিক পরিবারে অর্থনৈতিক সঙ্কটকে আরও গভীর করবে।

এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইতিমধ্যেই ৫ কোটি মানুষ অনাহারের মধ্যে পড়েছেন। খাদ্যশস্যের সরবরাহ ভেঙে পড়া এবং পরিবহণ খরচ ব্যাপক বেড়ে যাওয়ায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য গরিবের নাগালের বাইরে চলে গেছে। একই সঙ্গে, বেতন না বাড়ায়, মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় গোটা বিশ্বের প্রকৃত আয় কমছে।

ইউক্রেনের মাটিতে চলা এই সামরিক সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধিতে স্পষ্ট, এতে উভয় সাম্রাজ্যবাদী জোটের প্রকাশ্য বিরোধই শুধু বেড়ে চলেছে, যার একদিকে রয়েছে রাশিয়া ও তার সহযোগী শক্তিগুলি, অন্য দিকে রয়েছে ন্যাটো। এর একটাই অর্থ— এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত আণবিক যুদ্ধে রূপান্তরিত হবে ও মানবসভ্যতায় ধ্বংসের বিপদ নামিয়ে আনবে।

বিশ্বের বাজার, কাঁচামাল, বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা, সামরিক ও কৌশলগত সুবিধাজনক এলাকার দখলদারি কায়েমের লক্ষ্যে পুঁজিপতিদের মধ্যেকার স্থায়ী দ্বন্দ্বই যে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ— মার্ক্সবাদের এই বুনিয়াদী শিক্ষাকে ইউক্রেনের কমিউনিস্টরা আবারও তুলে ধরছে। পুঁজির প্রতিযোগিতার সঙ্কট যুদ্ধ ডেকে আনে। তাই মানবসভ্যতার ধ্বংস আটকাতে পুঁজির এই দ্বন্দ্বকে নির্মূল করতে হবে।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হল সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, কারণ তারাই যুদ্ধ বাধায়। বিবাদমান দুই দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির বিরুদ্ধেই এই সংগ্রাম চালাতে হবে। কখনওই এক দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির বিরুদ্ধে অপর দেশের পুঁজিপতি শ্রেণিকে শ্রমিক শ্রেণি সমর্থন করতে পারে না— যেমন তাদের কারওরই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে অস্বীকার করতে পারে না।

দ্য ইউনিয়ন অফ কমিউনিস্টস অফ ইউক্রেন মনে করে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে নিছক বিমূর্ত শান্তির স্লোগান বা নিরস্ত্রীকরণ নয়, জরুরি প্রয়োজন হল— পরজীবী এবং ধ্বংসাত্মক সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করা।

সেই লক্ষ্যেই লেনিনের শিক্ষাকে সামনে রেখে তাঁদের প্রস্তাব—এই যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধ বা শ্রেণিযুদ্ধে পরিণত কর। রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণির কাছেও এই আহ্বান তাঁরা রেখেছেন।

বিশ্ব বিপ্লবই শোষণমুক্তির একমাত্র পথ

গুয়াহাটির সভায় কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর ৭৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো আসামেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এই উপলক্ষে দলের আসাম রাজ্য কমিটির উদ্যোগে গুয়াহাটির রবীন্দ্রভবনে ২৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত এক সভায় দলের পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য নিচের বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতাটি তিনি অসমিয়া ভাষায় দেন। অনুবাদজনিত যে কোনও ত্রুটির দায়িত্ব আমাদের। — সম্পাদক, গণদাবী

(৩)

মালিকের মূল স্বার্থকে যদি আঘাত করা হয়, তা হলে মালিক টাকা দেবে না। আর টাকা না দিলে ক্ষমতায় যেতে পারবে না। আগেও নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু এখন আগের থেকে পুঁজিপতি শ্রেণির খেলাটা আরও মারাত্মক হয়েছে। তাই দেখুন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আব্রাহাম লিংকনের সেই ঐতিহাসিক কথা, ‘ডেমোক্রেসি ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল’, তার ছিটেফোঁটা আজ আর নেই। আজকের বাস্তবতা হচ্ছে ডেমোক্রেসি ফর দ্য ক্যাপিটালিস্ট, বাই দ্য ক্যাপিটালিস্ট, অফ দ্য ক্যাপিটালিস্ট। সব পুঁজিবাদী দেশেই এখন শাসন চালানোর রূপ হচ্ছে বুর্জোয়া ডিক্টেটরশিপ, বুর্জোয়া একনায়কত্ব।

নির্বাচনে এখন আর গণতন্ত্রের চিহ্ন নেই

অন্য দিকে মানুষের খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, মানুষ নিঃশব্দে অকাল মৃত্যুর বলি হচ্ছে। সামান্য টাকার জন্য মেয়েরা দেহ বিক্রি করছে, গ্রাম থেকে মেয়েরা শহরে যাচ্ছে, বেঁচে থাকার কোনও রাস্তা না পেয়ে। যেমন করে চাকরির জন্য লোকাল ট্রেনে করে মানুষ শহরে যায়, আবার বিকেলে অফিস থেকে ফেরে— এ ঠিক তেমনই। মেয়েরাও শহরে যায়, দেহ বিক্রি করে কিছু উপার্জন করে সেটুকু নিয়ে ফিরে যায়। আমি এটুকু বলতে চাইছি, মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে এই অবস্থার বলি হয়ে মৃত্যুমুখে পড়ছে আর ভোটের সময় তারা নিজেদের ভোট বিক্রি করছে। এটা নৈতিক না অনৈতিক সেটা নিয়ে দ্বিমত হওয়ার প্রশ্নই উঠছে না। খুব বেশি ধরলে ৫ শতাংশ মানুষকে বাদ দিয়ে বাকি ৯৫ শতাংশ মানুষের অসহায়তা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে ভেবে দেখুন। জাল ভোট দেওয়ার বা রিগিং করার প্রবণতা যেভাবে ছড়াচ্ছে, তার ফলে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, বিশ্ব পুঁজিবাদ আজ স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছে, হিংস্র হয়ে উঠেছে, ন্যূনতম গণতান্ত্রিক আচার-আচরণও আর তাদের থেকে আশা করা যায় না।

শুধু তাই নয়, বিশ্ব পুঁজিবাদ আজ ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠেছে। যত শীঘ্র পারা যায় বিপ্লবের আঘাতে এই পুঁজিবাদকে নির্মূল করতে হবে। বর্তমান যুগটা বোঝাতে গিয়ে মহান লেনিন বলেছেন ‘ইট ইজ

দ্য এরা অফ ইম্পিরিয়ালিজম অ্যান্ড প্রোলেটারিয়ান রেভলিউশন’ সর্বহারা বিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদের যুগ। তাই সব দেশেই সর্বহারা বিপ্লব অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এই বিপ্লবের মাধ্যমেই বুর্জোয়া একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে সর্বহারা শ্রেণির গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এটাই মহান লেনিনের শিক্ষা। এই তত্ত্ব এবং পথ অনুসরণ করে রাশিয়ায় বিপ্লব হল, তারপর চিন দেশে বিপ্লব হল। তারপর পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল। সাম্রাজ্যবাদী এবং পুঁজিবাদীদের চক্রান্তে সেই দেশগুলোতে সমাজতন্ত্র আজ আর নেই। কিন্তু এই কথাটাও সত্য যে সমাজতন্ত্র যতদিন সেখানে ছিল, দেখা গেল সেখানে সকলের মধ্যে ইকুয়ালিটি বা সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য একটার পর একটা দৃঢ় ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়েছে। অল্পদিনের মধ্যে সেখানে বেকার সমস্যার সমাধান হল, মুদ্রাস্ফীতি থাকল না, মূল্যবৃদ্ধি থাকল না, শোষণ-নির্যাতন থাকল না। সুতরাং শোষিত জনসাধারণকে এই সমাজতন্ত্রকেই তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য হিসাবে প্রতি মুহূর্তে সামনে রাখতে হবে।

আরও দেখুন, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সব দেশেই পুঁজিবাদী দলগুলো ভোটের মোহ প্রতিদিন তীব্র করার চেষ্টা করছে, আমাদের তা থেকে শোষিত জনগণকে মুক্ত করতে হবে। এই পথেই পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যত দ্রুত পারা যায় সম্পন্ন করতে হবে। ফলে সব দেশেই, যাদের মধ্যে ভোটের মোহ এখনও আছে, তাদের তা থেকে মুক্ত করতে হবে। মার্কসবাদী বিপ্লবীদের বিভিন্ন দেশে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার জন্য, সমস্ত রকম শোষণের অবসান ঘটানোর জন্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে হবে। প্রতিদিন জোরের সাথে সেই পথে পা ফেলতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ এই দিকটি আরও প্রাঞ্জল করে দিয়েছেন। ১৯৪৮ সালে সম্পূর্ণ একাকী একজন ব্যক্তি, নিঃস্ব, কেউ চেনে না, কিন্তু সঠিক পথে পদক্ষেপ করে, তীব্র আপসহীন সংগ্রাম করে এক মহান মার্কসবাদী চিন্তাবিদে পরিণত হলেন। মার্কসবাদের উন্নততর উপলব্ধির জন্ম দিলেন এবং ভারতে প্রকৃত বিপ্লবী দল, কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) গড়ে তুললেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষের অবদান মৌলিক

নিজ নিজ দেশে নির্ভুলভাবে মার্কসবাদী লাইন অনুসরণ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করতে গিয়ে মহান লেনিন এবং মাও সে তুঙ যে ভাবে মার্কসবাদী দর্শনের উপলব্ধির আরও উন্নতি ঘটালেন, ঠিক সেই ভাবেই ভারতের বুকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিশেষীকৃত করলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি বললেন, যে সব দেশে মার্কসবাদের সঠিক প্রয়োগের ভিত্তিতে বিপ্লব হবে সেই সব দেশে তার নেতার, চিন্তাবিদের চিন্তার মাধ্যমে মার্কসবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে নিশ্চিত রূপে কিছু মৌলিক চেতনা জন্মলাভ করবে, সেই জ্ঞানভাণ্ডারে নতুন চিন্তা সংযোজিত হবে। ভারতবর্ষের সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লব কমরেড শিবদাস ঘোষ সম্পন্ন করে যেতে পারেননি। তার আগেই অকালমৃত্যু তাঁকে হরণ করে নেয়। তবুও সর্বশক্তি দিয়ে এই বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রাম করতে গিয়ে মার্কসবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে এমন কতগুলো অবদান তিনি রেখে গেলেন, যেগুলো নিঃসন্দেহে মৌলিক।

বুর্জোয়া প্রচারযন্ত্রের চেষ্টা সত্ত্বেও মানুষ আন্দোলনে ফেটে পড়ছে

ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থা খুবই মারাত্মক হয়ে উঠেছে। সংকট কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে? বেকার সমস্যা কোন স্তরে গেছে? মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা কী? পুঁজিপতি শ্রেণির তাঁবেদারদের দুর্নীতি কোন পর্যায়ে গিয়েছে ? প্রতিটি ক্ষেত্রে অভাবনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ নিঃশব্দে মরছে। ওষুধ নেই, খাদ্য নেই। এ ছবি কোনও পত্রিকাতে আসে? কোনও টেলিভিশন চ্যানেলে ধরা পড়ে? আমার তো এরকম মনে হয় যে, টেলিভিশনের রং-বেরং-এর দৃশ্য দেখতে থাকলে একজন খেতে না পাওয়া মানুষও ভুলে যাবে যে, সে না খেয়ে আছে। বুর্জোয়া প্রচারযন্ত্রের বিষ ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা এই রকমই। পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশনের সাথে যুক্ত হয়েছে সোসাল মিডিয়া, স্মার্ট ফোন। এগুলো তো পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে প্রতিদিন মানুষের বিক্ষোভ আন্দোলনকে একেবারে গোড়া থেকেই মারার চেষ্টা করছে। কিন্তু তবুও এটাও সত্য যে পুঁজিপতি শ্রেণির বশংবদ রাজনৈতিক দলগুলোর এই ধরনের ন্যক্কারজনক কার্যকলাপ সত্ত্বেও শোষিত জনগণের বিক্ষোভ আন্দোলনকে তারা সমূলে দমন করতে পারেনি। আজ হত্যাকাণ্ড, কাল নারী নির্যাতন, এই সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে শোষিত জনসাধারণ জায়গায় জায়গায় প্রতিবাদ করছে, বিক্ষোভ করছে, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত করছে।

এখানে সংক্ষিপ্তভাবে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি উল্লেখ করতে চাই। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে কলকাতাকে বলা হত সিটি অফ রেভলিউশন। সেই সময়, এমনকি স্বাধীনতার পরেও পশ্চিমবঙ্গ ছিল বামপন্থী আন্দোলনের পীঠস্থান। যদিও আজ এই নামধারী বামপন্থীরা যে কোনও প্রকারে দেশের বিভিন্ন স্থানে বুর্জোয়া ব্যবস্থায় সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া আর টিকে থাকার জন্যে পুঁজিপতি শ্রেণির নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে গণ-আন্দোলনের পথ বর্জন করে বাস্তবে দক্ষিণপন্থী হয়ে উঠেছে। অন্য দিকে আমাদের সাংগঠনিক ক্ষমতা এই বিরুদ্ধ পরিবেশে বাড়লেও সমস্ত জনগণকে এখনও নেতৃত্ব দেওয়ার অবস্থা আমাদের নেই। তবুও আমি লক্ষ করছি, কোনও দল এগিয়ে এসে অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ না করলেও সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় বেরিয়ে আসছে, বেঁচে থাকার দাবি পূরণের জন্য বলিষ্ঠ আন্দোলন করছে, আত্মত্যাগ করছে, জেলে যাচ্ছে, পুলিশের মারধর সহ্য করছে। এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা আমাদের দেশে নয়, বেশ কয়েকটি দেশে গণঅভ্যুত্থানের মতো ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কাতে কী চলছে? হাজার হাজার মানুষ রাস্তায়—খাদ্য নেই, পরিধানের কাপড় নেই, অসহায় হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসছে এবং সরকার গুলি করে মারছে। তবুও মানুষ ঘরে ফিরে যেতে চাইছে না। যাবে কেমন করে? কী আছে সেখানে? মানুষ আজ যথার্থই সর্বহারা।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ বেঁচে থাকার পথ খুঁজে না পেয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হচ্ছে। অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু পরিমাণ হলেও মানুষের চোখ খুলছে। কম-বেশি পরিমাণে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই পুঁজিপতি শ্রেণির নির্মম শাসন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। ব্রিটেন ও আমেরিকাতে একই জিনিস হচ্ছে। সারা পুঁজিবাদী দুনিয়ায় প্রতিবাদী মানুষের মিটিং-মিছিল হচ্ছে।

ইউরোপের দেশগুলোতেও একই অবস্থা।

সাতের পাতায় দেখুন

কমরেড শিবদাস ঘোষ সংগ্রামী জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ভোটের মাধ্যমে সরকার বদলে কোনও কিছু হবে না। কেবলমাত্র ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করার মাধ্যমেই ন্যায্য স্বার্থ পূরণ হতে পারে এবং এই আন্দোলনগুলো বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে গড়ে তুলতে হবে।

কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের ভাষণ

ছয়ের পাতার পর

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সৃষ্টি কেন হল? ইউরোপের দেশগুলি ঐক্যবদ্ধ হলে দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যাবে, অর্থনৈতিক উন্নতি হবে— এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গঠিত হওয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের আজকের অবস্থা কী? সেখানেও ভাঙন দেখা দিয়েছে। জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা বলেছিল যে, আমরা সবাই ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্ম দিচ্ছি, সেখানে তোমাদের কোনও অভাব-অভিযোগ থাকবে না, সবারই সমৃদ্ধি হবে। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে তার সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখা দিল। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গ্রেট ব্রিটেন তো বেরিয়েই গেল। কেন? তীব্র অর্থনৈতিক সংকট কমার পরিবর্তে বহু গুণে বেড়ে যাওয়ায় সেখানকার জনসাধারণ তাদের সরকারকে বাধ্য করল তা থেকে বেরিয়ে আসতে। একইভাবে আরও কিছু সদস্য দেশ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করছে। তীব্র সমস্যার সামনে পড়ে সেইসব দেশের জনসাধারণও এই দাবি তুলছেন। আপনারা লক্ষ করবেন, বুর্জোয়া শাসকদের বিভিন্ন প্রকারের অসদাচরণ, শুধু মিথ্যে আশ্বাস, এটা করে দেবো, সেটা করে দেবো, আমাদের ভোট দাও, আমরা সরকারে গেলে তোমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এই কথাগুলো শুনে শুনে শোষিত জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। এই কথাগুলো মানুষ বিশ্বাস করছে না। এটা ঠিক যে মানুষ ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারছে, ভোট রাজনীতিতে কিছু হবে না। কিছু যদি হয় আন্দোলন করেই হবে। এই ধারণা ও চিন্তার ভিত্তিতে মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে আসছেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, মানুষের এই আন্দোলনগুলোর সামনে আমাদের দলের বাইরে আর কোনও বিশ্বস্ত নেতৃত্ব নেই। মানুষ বেরিয়ে আসছে, কিন্তু সঠিক রাজনৈতিক আদর্শে পরিচালিত নেতৃত্ব বাদ দিয়ে আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালিত হবে কেমন করে? বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় কেমন করে পরিচালিত হবে আন্দোলন? এই জন্যই কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, গণআন্দোলন অতি অবশ্যই পরিচালিত হতে হবে সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক, মহিলাদের আন্দোলনের বন্যার জন্ম দিতে হবে। কিন্তু সেটা যদি শুধু স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হয়, সেখানে যদি বিপ্লবী বিশ্বস্ত সংগ্রামী নেতৃত্ব না থাকে, তা হলে বুর্জোয়ারা হয় মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে, আর না হলে লাঠি-গুলি দিয়ে আন্দোলন স্তব্ধ করে দেবে। সংগ্রামী জনসাধারণকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেবে না। সুতরাং বারবার কমরেড শিবদাস ঘোষ সংগ্রামী জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ভোটের মাধ্যমে সরকার বদলে কোনও কিছু হবে না। কেবলমাত্র ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করার মাধ্যমেই ন্যায্য স্বার্থ পূরণ হতে পারে এবং এই আন্দোলনগুলো বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে গড়ে তুলতে হবে। নেতৃত্ব ঠিক থাকলে কিছু কিছু দাবি আদায় হবে। প্রথমবার হয়তো আটটা দাবি থাকলে তার তিনটে আদায় হবে। একটা দাবি আদায়ের পর আর একটা আন্দোলন হবে, কিন্তু ভোটের মাধ্যমে নয় বা অন্য কোনও পথেও নয়, জ্যোতিষীর দ্বারাও নয়, যাগ-যজ্ঞ, আজানের দ্বারাও নয়। জ্বলন্ত দাবিগুলোর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, ন্যায্য দাবিপূরণের জন্য বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালিত হতেই হবে।

পৃথিবীর সব দেশে অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে সব দেশেই আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বে। বিপ্লবী দল নেতৃত্ব দিলে শেষপর্যন্ত এই সব আন্দোলন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করবে। সাথে সাথে এই কথাটা আমি বলতে চাই যে এখনও সমাজের সব জায়গায় প্রধান ধারা কিন্তু আন্দোলন নয়। প্রকৃত বিপ্লবী আন্দোলনের সম্প্রসারণ না ঘটলে সেটা হবে কেমন করে? সুতরাং নির্বাচনের মাধ্যমে যে শোষিত জনসাধারণের মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান, শোষণ নির্যাতনের অবসান সম্ভব নয়— এই কথাটা বারবার জনসাধারণকে বোঝাতে হবে। এই ক্ষেত্রে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার আমাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন যে, শুধু সমস্যাগুলো বর্ণনার মাধ্যমে নয়, জনসাধারণকে তত্ত্বের মাধ্যমেই বোঝাতে হবে। সমস্যার বর্ণনা শুনে শুনে জনসাধারণের কাছে এই কথাগুলো কিছুটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু বিপ্লবীরা নতি স্বীকার করে না। তারা শুধু তাদের সংগ্রাম তীব্রতর করতে পারে। আবার আপনাদের আমি বলব, ঠিক ঠিক ভাবে আপনারা অনুভব করুন, গরিব আরও গরিব হচ্ছে, গরিব মানুষ কিছু না পেয়ে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করছে। আর আত্মহত্যা যারা আজও করে উঠতে পারেনি, তারা মনে মনে ভাবছে, বেঁচে থেকে লাভ নেই।

ভয়াবহ সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংকট

অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা, এমনকি হিংসা, হত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি, অসহিষ্ণুতা, মূল্যবোধের মৃত্যু সীমাহীন দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে। একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। আজ ঋণ পরিশোধ করার কোনও পথ না পেয়ে সর্বস্বান্ত মানুষ আত্মহত্যা করে বাঁচার পথ বেছে নিচ্ছে। আর দিন দিন এই প্রবণতা বেড়েই চলেছে। আবার কোথাও গোটা পরিবার আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। এইসব ঘটনা প্রতিদিন বাড়ছে। এই সব নিয়ে আমাদের দলের বাইরে আর কোনও দলকে আপনারা চিন্তা করতে দেখেছেন? শুধু তাই নয়, আজ গোটা সমাজজীবন, পারিবারিক জীবন, মানুষের সাথে মানুষের মমতা-স্নেহের সম্পর্ক সবই লোপ পেয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশ সহ সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংকট সংঘাতিক আকার ধারণ করেছে। একটার পর একটা মূল্যবোধ ধসে পড়ছে। শোষিত সর্বস্বান্ত জনসাধারণের সামনে বেঁচে থাকার কোনও সুস্থ, ন্যায়সঙ্গত উপায় নেই। পুঁজিবাদী শাসকরা এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে গরিব সর্বস্বান্ত মানুষকে অ্যান্টিসোসাল, গুন্ডা, বদমাশ বানাচ্ছে এবং তাদের ব্যবহার করে ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনগুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে।

কী ভয়ানক চক্রান্ত ভেবে দেখুন, যারা মানুষকে শোষণ করে শেষ করে দিচ্ছে, নানা ভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে, সমস্ত মূল্যবোধ কেড়ে নিচ্ছে, তারাই আবার মানুষকে বর্বর হত্যাকারী বানাবার চেষ্টা প্রতি মুহূর্তে করছে। মহান চিন্তাবিদ কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের প্রশ্ন করেছেন— বলুন, এই অগ্নিগর্ভ অবস্থা আপনার থেকে কী চাইছে? অনুভব করুন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা জনসাধারণ আপনাদের কাছে কী আবেদন জানাচ্ছেন? এই অবস্থায় আমাদের কর্তব্য ধরিয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন— এই অবস্থায় পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত নির্যাতিত ৯৫ শতাংশ মানুষের যে মৌলিক দ্বন্দ্ব কাজ করছে, তাকে ঠিক ঠিক ভাবে উপলব্ধি করে তাদের জঙ্গি গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোর মধ্য দিয়ে শ্রেণিসংগ্রামের দিকে নিয়ে যেতে হবে। তাকে বানচাল করার জন্য শোষক পুঁজিপতি শ্রেণি যে কৌশলগুলো অবলম্বন করছে, শোষিত জনসাধারণের নৈতিক বল ধ্বংস করার যে চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে, তাকে প্রতিহত করতে হবে, ব্যর্থ করতে হবে।

চাই সর্বহারা শ্রেণিচেতনা ও মূল্যবোধ

এই অবস্থায় বিশ্বের সব বিপ্লবী দলকে সর্বহারা বিপ্লবী চেতনায়, মূল্যবোধ নতুন করে জাগিয়ে তুলতে হবে। এখন দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে আবার আমি দু-একটা কথা বলতে চাই। সেটা হল, কংগ্রেস যে বুর্জোয়া শ্রেণির একটা অতি বিশ্বস্ত দল, আমরা ছাড়াও দেশের চিন্তাশীল অনেক লোক এই সম্পর্কে সচেতন। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় থেকে ওই শতকের শেষ পর্যন্ত গোটা দেশে কংগ্রেস শাসনের সময় নির্মম শোষণ, দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার, অনাচার-অত্যাচারের বলি হয়ে মানুষ ক্রমশ অভিজ্ঞতার নিরিখে বুঝল যে কংগ্রেসের দ্বারা আর হবে না। আর এই সুযোগেই পুঁজিপতি শ্রেণি তাদের দ্বিতীয় দল, আরএসএস-এর রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপিকে সামনে নিয়ে এল এবং ভোটে জিতিয়ে তাকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিল। উল্লেখ্য, সিপিআই, সিপিআই(এম) নিজেদের বামপন্থী বলে দাবি করলেও বামপন্থার যে মর্মবস্তু— জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, নির্বিশেষে সমস্ত খেটে খাওয়া শ্রমজীবী জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে লাগাতার শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার যে আদর্শ, পুঁজিপতি শ্রেণির সঙ্গে সমঝোতা গড়ে তুলতে গিয়ে তা পরিত্যাগ করল। আর এইভাবেই এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণি আরএসএস-বিজেপি চক্রকে ক্ষমতায় আনার পথ সুগম করে দিল। টাকা-পয়সা এবং প্রচার যন্ত্রের ঢল নামিয়ে পুঁজিপতি শ্রেণি তাদের সাহায্য করল। ১৯৯৮ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকে একটার পর একটা রাজ্যে তারা ক্ষমতায় বসতে থাকল। তখন থেকে আজ অবধি অবস্থা একই রকম। যে বাকি ক'টা অ-বিজেপি রাজ্য এখনও কোনও প্রকারে টিকে আছে, সেই সরকারগুলো বিজেপির হাতে পরাজিত হওয়ার ভয়ে আতঙ্কিত।

এখন প্রশ্ন হল, এই অভাবনীয় ঘটনা ঘটল কেমন করে? চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী শক্তির এই উত্থানের মূল কারণ যথার্থ সংগ্রামী বামপন্থী ভাবধারায় জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত শোষিত জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের ন্যায্য এবং জরুরি দাবিগুলো পূরণের দাবিতে লাগাতার শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে সিপিআই, সিপিআই(এম)-এর মতো বামপন্থী বলে দাবিদার দলগুলো এগিয়ে এল না। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিল পুঁজিপতি শ্রেণি, আরএসএস, বিজেপি। বামপন্থী বলে দাবি করা সিপিআই(এম) এবং তাদের সহযোগী দলগুলো ভোটের মাধ্যমে এবং পুঁজিপতি শ্রেণির সহায়তা নিয়ে পুঁজিপতি শ্রেণির দলগুলোর মতোই ক্ষমতায় যাওয়ার রাস্তা পরিষ্কার করতে মুখে মাঝে-মধ্যে আন্দোলনের কথা বলে। কিন্তু আসলে তারা গণআন্দোলনের পথ পরিহার করেছে।

এইখানে আপনাদের আমি স্মরণ করাতে চাই যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিতর থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহান লেনিনের শিক্ষার ভিত্তিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, নির্বাচন না থাকা অবস্থায় বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউ তৈরি হওয়ার পথে যখন নির্বাচন আসবে, তখন বিপ্লবী দল এবং তার মিত্র দলগুলি মিলে এই নির্বাচনের সামনে একটা সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। আর জোটবদ্ধ হয়ে যদি তারা পার্লামেন্টের ভিতরে এক বা একাধিক প্রতিনিধি পাঠাতে পারে তাহলে বাইরে যে দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলন করবে, বিধানসভা, সংসদের ভিতরে বিপ্লবী বিধায়করা-সাংসদরা বলিষ্ঠভাবে জনসাধারণের সেই দাবিগুলো মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করবে। এইভাবে কয়েকটা সিটে যদি জেতা যায়, তা হলে বিধানসভা এবং সংসদের ভিতর এবং বাইরে এইভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়াই হবে বিপ্লব না হওয়া পর্যন্ত বিপ্লবী আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ, এটাই হচ্ছে মূল কথা। এটাই হচ্ছে সঠিক রণনীতি।

(চলবে)

পৃথিবীর সব দেশে অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে সব দেশেই আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বে। বিপ্লবী দল নেতৃত্ব দিলে শেষপর্যন্ত এই সব আন্দোলন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করবে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

স্মরণে-শপথে পালিত হল বিপ্লবী ক্ষুদিরামের আত্মোৎসর্গ দিবস

এ বছর ১১ আগস্ট ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ১১৫তম আত্মোৎসর্গ দিবস। এ বছরটি স্বাধীনতারও ৭৫ বছর পূর্তি। যে স্বাধীনতার স্বপ্ন ক্ষুদিরাম সহ শত-সহস্র বিপ্লবীরা দেখেছিলেন তা যে আসেনি তা সমাজে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, অনাহার, নারী নির্যাতনের ঘটনাতেই স্পষ্ট। ধনী-দরিদ্রে বৈষম্য আকাশ ছুঁয়েছে। পুঁজিবাদী শাসনের অমোঘ পরিণতি হিসাবে নৈতিক অধঃপতন আজ চরম সীমায় পৌঁছেছে। শাসক দলগুলির নেতাদের দুর্নীতি-নীতিহীনতা মানুষকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। সাড়ে সাত দশকে দেশের পুঁজিবাদী শাসকরা পুঁজিবাদকে আরও সংহত করেছে। দেশ জুড়ে চলছে তারই 'অমৃত-মহোৎসব'। এই অবস্থায় মানুষের মুক্তির আন্দোলন শক্তিশালী করতে বিপ্লবীদের জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস, কমসোমল ও পথিকৃৎ-এর পক্ষ থেকে দিনটিকে যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়। রাজ্য জুড়ে কয়েক হাজার জায়গায় ছবিতে মাল্যদান, ব্যাজ পরিধান, শপথবাক্য পাঠ, প্যারেড, আলোচনা সভা প্রভৃতি আয়োজিত হয়। এ দিন মূল অনুষ্ঠানটি ছিল কলকাতা হাইকোর্টের সামনে ক্ষুদিরাম মূর্তিতে মাল্যদানের। সকাল সাড়ে ছটায় মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল সহ গণসংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা। এ ছাড়াও রাজ্যের অজস্র স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে, স্টেশনে, বাজারে, রাস্তার মোড়ে ছবিতে মাল্যদান করা হয়। সর্বত্র সাধারণ মানুষ গভীর আবেগে ছবিতে মাল্যদান করেন।

লিগাল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে কলকাতা হাইকোর্টে ক্ষুদিরামের ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিশ্বব্রত বসুমল্লিক, প্রাক্তন সম্পাদক অমল মুখোপাধ্যায়, কল্লোল বসু সহ বহু আইনজীবী, ল-ক্লার্ক ও অন্যান্যরা (নিচের ছবি)।

পূর্ব বর্ধমানে কৃষক-খেতমজুরদের বিক্ষোভ

অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলাকে খরাপীড়িত ঘোষণা সহ অন্যান্য দাবিতে ৫ আগস্ট জেলাশাসক দপ্তরে ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ মিছিল হয়।

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস স্মরণ

কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন ও মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ

সংগ্রহ করুন

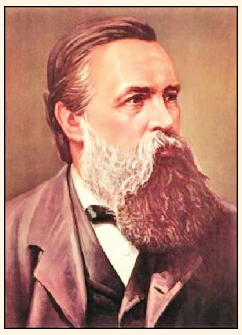

মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস স্মরণে

প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

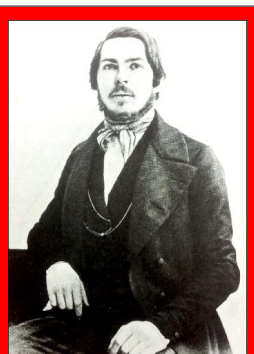

In Memory of Great Friedrich Engels

PROVASH GHOSH

Socialist Unity Centre of India (C)

পুলিশের হাতে বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহের যথেচ্ছ অধিকার বিজেপি সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১২ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, চরম অগণতান্ত্রিক ক্রিমিনাল প্রসিডিওর (আইডেন্টিফিকেশন) অ্যাক্ট ৪ আগস্ট থেকে চালু করার নোটিফিকেশন জারি করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি। গত এপ্রিল মাসে সংসদে পাশ হওয়া এই আইন গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্ত বিচারাধীন বন্দি ও দোষী সাব্যস্ত সকলের বায়োমেট্রিক ও আচরণগত সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করার অধিকার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস বুরো (এনসিআরবি) এই তথ্য ৭৫ বছর সংরক্ষণ করতে পারবে। পুলিশ, সিবিআই ইত্যাদি তদন্তকারী সংস্থা তা ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারবে। এর ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেই তার সমস্ত তথ্য সংগ্রহ ও তা সংরক্ষণের অধিকার পেয়ে যাবে। অভিযোগের গুরুত্ব বিচারের কোনও দরকারও পড়বে না। এই আইন মানবাধিকারের সম্পূর্ণ বিরোধী।

জনসাধারণের ওপর এই আক্রমণ নিঃসন্দেহে একটি স্বৈরতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক পদক্ষেপ। এই আইন বাতিল করার দাবিতে এগিয়ে আসা এবং ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা আজ সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের অবশ্যকর্তব্য।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com